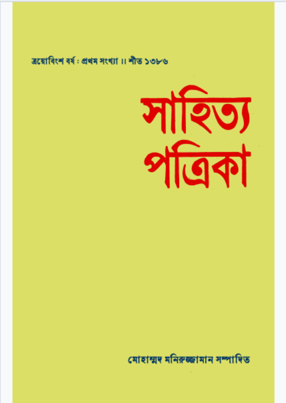

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চতুরঙ্গ

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Akram Hossain
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.4
Pages	52-72
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চতুরঙ্গ

সৈয়দ আকরম হোসেন

চতুরঙ্গ[১] বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিতর্কিত ও সন্দিগ্ধ শিল্পকর্ম। সে সংশয় কেবল শিল্পোৎকর্ষ বিচারে নয়, আঙ্গিক বিবেচনার প্রশ্নেও। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের 'উপন্যাস' শীর্ষক পরিচ্ছেদ থেকে চতুরঙ্গ পরিহার করে একাদশ পরিচ্ছেদে 'রূপক' শিরোনামায় আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে :

> সাঙ্কেতিক রচনা---বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্পের উৎকর্ষের সবচেয়ে বেশী পরিচয় পাই সেই সকল রচনায় যেখানে সাঙ্কেতিকতা সাধারণ সুখ-দুঃখের কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এই সংমিশ্রণের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ দেখিতে পাই 'চতুরঙ্গ' গদ্যকাব্যে।[২]

বিশ্বপতি চৌধুরী তাঁর 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে চতুরঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম বাক্যে মন্তব্য করেন :

> খাঁটি উপন্যাস বলিতে সাধারণতঃ যে শ্রেণীর রচনাকে বুঝায়, চতুরঙ্গ ঠিক সে শ্রেণীর নয়।[৩]

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন :

> চতুরঙ্গের পৃঃ সংখ্যা ১২৩; কিন্তু এই তালিকায় তাহার উল্লেখ না থাকিবার কারণ ও-বইখানা পূরা উপন্যাসও নয়; আবার রীতিমতো ছোটগল্পও নয়; উপন্যাস ও ছোট গল্পের গাঁটছড়া বাঁধিয়া ওখানা রচিত, উহাকে বর্তমান হিসাবের মধ্যে ধরিলে চলিবে না।[৪]

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থমালার 'রবীন্দ্রনাথ' খণ্ডে চতুরঙ্গের শিল্পোৎকর্ষ সম্পর্কে অনেক গূঢ় তাৎপর্যবাহী মন্তব্য করলেও, এর আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ নন :

---

১ সবুজপত্রে প্রকাশ : অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৩২২/১৯১৬

২ "রবীন্দ্রনাথ", (চতুর্থ সংস্করণ; কলিকাতা : এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি: ১৩৫৯), পৃ. ২৩১

৩ "কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ", (তৃতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ ১৩৭১), পৃ. ৭৯

৪ "রবীন্দ্র-বিচিত্রা", (তৃতীয় প্রকাশ; কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৩৬৮), পৃ. ২৯

> বইটির চারিটি "অঙ্গ" বা ভাগ—'জ্যাঠামশায়,' 'সচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'—যেন চারিটি গল্প। [এগুলি স্বতন্ত্র গল্পরূপেই সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল]।[৫]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারণা :

> চতুরঙ্গ রচিত হয় সবুজপত্রের সাতটি ছোটগল্প ও একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনার মাঝখানে ও ফাল্গুনী নাটিকার অব্যবহিত পূর্বে। ছোটগল্প ও উপন্যাসের মাঝে এটি রচিত বলিয়া ইহার মধ্যে ছোটগল্পের রীতি ও উপন্যাসের গতি দুইই স্পষ্ট।[৬]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে চতুরঙ্গ উপন্যাসকে সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত বলে মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায় :

> রবীন্দ্রনাথের শেষ-যুগের উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary), ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ভাবগভীরতার পরিবর্তে লঘু ও দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে।[৭]

চতুরঙ্গের আঙ্গিক ও শিল্পোৎকর্ষ প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিতর্ক ও সন্দেহের কারণ, প্রথমতঃ এর অপূর্বতা ও অত্যাধুনিকতা[৮]; দ্বিতীয়তঃ চতুরঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিকবিষয়ক প্রথাগত রীতির প্রতিফলন প্রত্যাশা করা[৯]; তৃতীয়তঃ চতুরঙ্গের প্রতিটি কিস্তি ভিন্ন শিরোনামে সবুজপত্রে প্রকাশ।

জাঁপল সার্ত্র ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কোন দার্শনিক সার্থক উপন্যাস রচনায় সমর্থ হননি এবং এও অধিকতর সত্য যে, জীবনদর্শনবিহীন ও জীবনার্থবিবিক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষেই মহৎসৃষ্টি অসম্ভব। সারভেন্টিস, স্তাঁদাল, দস্তয়েভস্কি, লিও টলষ্টয়, আনাতোল ফ্রাঁস, টমাস মান, জেমস্ জয়েস প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র জীবনদর্শন শাসিত, তাঁদের উপন্যাসও জীবনতত্ত্বের শিল্প-প্রতিমান। এ কথা রবীন্দ্রউপন্যাস সম্পর্কে আরও নির্ভুল।

---

৫ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", তৃতীয় খণ্ড, (তৃতীয় সংস্করণ; কলিকাতা : ইষ্টার্ন পাবলিশার্স ১৩৬৮), পৃ. ৩৮৬

৬ "রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক", দ্বিতীয় খণ্ড (পরিবর্ধিত সংস্করণ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৫৫), পৃ. ৩৮২

৭ "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", (চতুর্থ সংস্করণ; কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৬৯), পৃ. ১৬০

৮ স্মরণীয়, ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর The Voyage out প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে এবং জেম্স জয়েস-এর A portrait of the Artist as a young Man প্রকাশ পায় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে। দ্রষ্টব্য : সৈয়দ আকরম হোসেন, 'চতুরঙ্গে রবীন্দ্রমানস; তার পরিপ্রেক্ষিত' "উত্তরাধিকার", বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, (৭ম বর্ষ : প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা ১৯৭৯) পৃ. ৩৬-৪০

৯ এ সম্পর্কে জে. বি. প্রিষ্টলের সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য :

"Coming into existence to please an increasingly varied number of readers, novels, good novels too, can be of various Kinds—a statement only the narrowest and most intolerent critic of fiction would deny" —J. B. Priestley, *Literature and Western Man*, (London : Mercury Borks 1962), P. 65

রবীন্দ্রসাহিত্যে এ তত্ত্ব বহুবার উচ্চারিত যে, জীবনে গতিবাদ ও স্থিতিবাদ—কোনোটিই সত্য নয়, এবং উভয়ই সত্য। কারণ গতি ও স্থিতির সুসামঞ্জস্য ও সংশ্লেষণী থেকেই আসে এর পূর্ণতা। এই পূর্ণতাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখলেই সত্য বিকৃত হয়; এই পূর্ণতার মাঝে গতিময় রূপজগৎ ও স্থিতিশীল অরূপলোক উভয়ই সংশ্লিষ্ট—একটিকে একান্তভাবে গ্রহণ করলে উভয়ই অসত্য হয়ে ওঠে। শচীশের জীবনে উল্লিখিত গতি, স্থিতি ও পূর্ণতার তিনটি স্তরই ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছেন—জ্যাঠামশায়ের শিষ্য-রূপে শচীশ জগতের গতিকে, তার বাইরের দৃশ্যমান রূপকে দেখছিল জ্ঞানের মধ্যে; লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য হয়ে সে স্থিতির মধ্যে, অনুভূতি ও রসের মধ্যে জগতকে দেখল। উভয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত শচীশ যে সত্যের সন্ধান পেল তা পূর্ণতার রূপ। উল্লিখিত দর্শন 'চতুরঙ্গের' প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়[১০] মনে করেন, এবং এ প্রসঙ্গে তিনি রোমাঁ রোলার[১১] বক্তব্যেরও সমর্থন নিয়েছেন।

অশ্রুকুমার সিকদার 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-উপন্যাস, তার আধুনিকতা' প্রবন্ধে চতুরঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় চকিত মন্তব্য করেছেন,---'[চতুরঙ্গ] উপন্যাসের বিষয় চরিত্রের বিবর্তন-বিকাশ বা ত্রিভুজসমস্যার জটিলতা দেখানো নয়, রেনেসাঁসের যুক্তিবাদের সারবত্তাহীনতা দেখানো'[১২]—মন্তব্যটি সত্যবিবর্জিত নয়, তবে যথেষ্ট পরিচ্ছন্নও নয়। রবীন্দ্র-জীবনার্থ কখনোই নঙর্থক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ কিংবা বিলুপ্ত নয়। বাংলার অসম্পূর্ণ রেনেসাঁসের অশক্ত যুক্তিবাদ শচীশের জীবনে Anti-thesis মাত্র, তার জীবনের পরিণামী সংশ্লেষণী (Synthisis) নয়।

প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জীবনদর্শনের, সভ্যতার একমাত্রিকতার অসম্পূর্ণতা, 'চতুরঙ্গের' পরিপ্রেক্ষিত। আত্মিক সাধনাবিহীন, বস্তুজাগতিক ফললাভে আপাত স্ফীত পাশ্চাত্যসভ্যতা যেমন মানব-জীবনের পূর্ণতাদানে ব্যর্থ; তেমনি বস্তুজাগতিক কর্ম-নিষ্ঠাবর্জিত অধ্যাত্মমুখী প্রাচ্যসভ্যতাও মানুষের পূর্ণ হয়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধক। বস্তুসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার সুসমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনার্থই মানুষকে দেয় প্রকৃত মুক্তি, পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ পুরাণ থেকে উপমা যোজনা করে, তাঁর এই সংশ্লেষণাত্মক জীবনতত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, সেই হল প্রকৃত মিলন।'[১৩]

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র তাঁর এ-জীবনদর্শনের বিবরণ দিয়েছেন:

> পূর্ণকে উপলব্ধি করতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয় সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি। এই হোল আমার নিজের কথা।...য়ুরোপের সাধকেরা যে মুক্তির পথে অসীম অধ্যবসায়ে মানুষের সহায়তা করচে তাকে আমি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেচি, আবার ভারতীয় সাধকেরা আপনার

---

১০ দ্রষ্টব্য: "রবীন্দ্রজীবনী", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬

১১ দ্রষ্টব্য: রোঁমা রোলা লিখিত চতরঙ্গের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকা, "শান্তিনিকেতন", ৬ : ৩, চৈত্র, ১৩৩১, পৃ. ৫৩-৫৬

১২ অশ্রুকুমার সিকদার, 'রবীন্দ্র উপন্যাস, তার আধুনিকতা', "বিশ্বভারতী পত্রিকা", (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩), পৃ. ৩৭

১৩ 'শিক্ষার মিলন', "সংকলন", (পুনরমুদ্রণ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৩৬৩), পৃ. ২৭

মধ্যে আত্মজ্যোতির্দর্শনের যে সাধনাকে গ্রহণ করেচেন তাকেও আমি প্রণাম করে মেনে নিই। এই উভয়ের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়ে যদি পংক্তি বিভাগ করি, এবং এক পাশ ঘেঁষে সমস্ত জীবন কেবল শুচিবায়ুর চর্চা করি তাহলে কৃপণের গতি লাভ করব।[১৪]

গতি, স্থিতি ও পূর্ণতা ; কিংবা রেনেসাঁসের যুক্তিবাদের সারবত্তাহীনতা দেখানো ; অথবা আত্মা-বিমুখ জড়বাদী ইউরোপের বস্তুনিষ্ঠ মানববাদী কর্মযোগ ও আত্মনিষ্ঠ কর্ম-বিমুখ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, উভয়ই অসম্পূর্ণ এবং এ-দুয়ের সুসমন্বয়ই জীবনের পূর্ণতা ইত্যাদি—'চতুরঙ্গে'র প্রতিপাদ্য যাই হোক না কেন, সে-সব হলো দার্শনিক তত্ত্বকথা। তত্ত্বকথা মূলতঃ বিশুষ্ক, বীজগণিতের সঙ্কেতের মত জ্ঞানময়। জ্ঞানের কথাকে ভাবের কথা হয়ে পাঠকচিত্তে সঞ্চারক্ষম হতে গেলে, তাকে হতে হবে আবেগময়, আকারময়, সপ্রাণ ও অনুভূতিমুখর। 'চতুরঙ্গে'র তত্ত্ব বিশুদ্ধ দর্শনতত্ত্ব নয়, তা জীবনতত্ত্ব—এবং সে তত্ত্ব গ্রন্থ কিংবা শুদ্ধ মেধাঅর্জিত নয়, তা হলো ঔপন্যাসিকের চেতনাতল উৎসারিত জীবনার্থ।

হিন্দুধর্ম থেকে সর্বাস্তিবাদী মানবধর্ম এবং হিন্দুজাতীয়তাবাদ থেকে বিশ্বজাগতিকবাদ—রবীন্দ্রনাথের জীবনার্থ সন্ধানের দীর্ঘ দ্বন্দ্বময় গতিপথ যেমন 'গোরার' পরিপ্রেক্ষিত, তেমনি 'চতুরঙ্গ'-ও রবীন্দ্রনাথের অরূপ অধ্যাত্মরসে নিমজ্জনদশা থেকে সত্যকর্ম ও বিশ্বকর্ম উপলব্ধিজাত মনুষ্যত্ববোধে উত্তরণের নিগূঢ় ইতিকথা। রবীন্দ্রনাথ (২১শে এপ্রিল ১৯৩১) শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীকে ৪ সংখ্যক পত্রে লেখেন :

আমার মনে পড়চে আমিও এক সময়ে স্বভাবতই যে সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান—সংসার থেকে হৃদয়ের যে তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায় নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মথন করে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। বৈষ্ণব কবিরা আমার এই আত্মভোগের নৈবেদ্য ভরে তোলবার সহায়তা করেছিলেন। কিছুদিন এই রসস্রোতে গা-ঢালান দিয়েছি। কিন্তু সত্য তো কেবলি রসো বৈ সঃ নন তাই এক সময় আমার ধিক্কার এলো—সেই নিমজ্জনদশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি বলে বুঝলুম। ···একদিন অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলুম, রসের সাধনার অনেকটাই সেই ফেনা, বাষ্পোচ্ছ্বাস—যাঁর সামনে ধরি তাঁকেও ফাঁকি দিই, নিজেকেও। অন্ততঃ আজ এটুকু বুঝেছি কর্ম্মের মধ্যে যে উপলব্ধি তাতে মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করা হয়।[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ১৯ সংখ্যক পত্রে পুনরায় লেখেন :

একদা প্রথম বয়সে কবিতা ছিলেন একেশ্বরী—ধরণীর আদিযুগে যেমন সমস্তই ছিল জল। মনের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত তারি কল-কল্লোলে ছিল মুখরিত। নিছক ভাবরসের লীলা, স্বপ্নলোকের উৎসব। তার-পরে দ্বিতীয় বয়সে এল কাজের তাগিদ। সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে কাছাকাছি মিলতে হোলো। তখনি এলো কর্ত্তব্যের আহ্বান। জলের ভিতর থেকে স্থল মাথা তুলল। সেখানে জলের ঢেউয়ে আর উনপঞ্চাশ পবনের

১৪ 'পত্র সংখ্যা ৩১' "চিঠিপত্র ৯", (কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৭১), পৃ. ৭৪-৭৫

১৫ 'পত্র সংখ্যা ৪' ঐ, পৃ. ১১-১২

ধাক্কায় টলে' টলে' কেবল ভেসে বেড়ানো নয়, বাসা বাঁধার পালা, বিচিত্র তার উদ্যোগ। মানুষকে মানতে হোলো, রঙীন প্রদোষের আবছায়ায় নয়, সে তার সুখ দুঃখ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল বাস্তব লোকে। সেই মানব অতিথি যখন মনের দ্বারে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে, অয়মহং ভোঃ, সেই সময়ে ঐ কবিতাটা লিখেছিলুম, এবার ফিরাও মোরে। তখন থেকে জীবনের আর এক পর্ব্ব সুরু হোলো। একটা আরেকটাকে প্রতিহত করলে না—মহাসাগরে পরিবেষ্টিত মহাদেশের পালা এলো।[১৬]

বৈচিত্র্যময় জীবন ও রূপজগৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রকৃতিধর্ম অস্বীকার করে অরূপকে যে পাওয়া যায় না, একথা কেবল চিঠিতেই নয়, 'সোনারতরী'র (১৩০০) পরশপাথর (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯), আকাশের চাঁদ (আষাঢ় ১২৯৯) ও দেউল (ফাল্গুন ১২৯৯) কবিতায়ও রূপকার্থ ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তা অভিব্যক্ত করেছেন। 'মানসী' (১২৯৭)-পর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন শুদ্ধ ভাবময়তায় নিমজ্জিত। রূপজগৎমুখী চৈতন্যকে অবরুদ্ধ করে, পঞ্চেন্দ্রিয় বিনাশী রবীন্দ্রনাথ এ-সময় ছিলেন অরূপ সত্যের অভিসারী। অবশেষে বহমান লোক-জীবন অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ আত্মজিজ্ঞাসার প্রক্রিয়ায় তাঁর মানসজাগরণ ঘটে ; তিনি সুখ-দুঃখবিরহমিলনপূর্ণ লোকায়ত মানবজীবনকেন্দ্রে আবিষ্কার করেন রূপ-অরূপের, কর্ম ও আত্মসাধনার নিয়ত মিলন। জগমোহনের মৃত্যুর পর কর্মময় জগৎবিমুখ শচীশ অধ্যাত্ম সাধনার সংকীর্ণতায় চৈতন্যকে অবরুদ্ধ করে ভাবরসে নিমজ্জিত হয়। অবশেষে জীবন-প্রতিভূ দামিনীর[১৭] প্রবল প্রবর্তনায় দোলাচলে দগ্ধ হয়ে জাগে তার আত্মোপলব্ধি, কর্মজগতের সীমানায় ঘটে তার অধ্যাত্মমুক্তি। কেবল 'চতুরঙ্গ' নয়, গূঢ় অর্থে রবীন্দ্র-নাথের সকল সৃষ্টিই মূলতঃ আত্মজৈবনিক।

আত্মজৈবনিক বলতে আমরা বুঝাতে চেয়েছি সূক্ষ্ম অনুভববেদ্য, সতর্কইন্দ্রিয় ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মঅভিজ্ঞতা[১৮] অর্জিত বহুস্তরীভূত চেতনাপ্রবাহকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব, তাঁর চেতনা-প্রতীতি-অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ উৎসারিত বলেই তা নির্ভার, উষ্ণ ও তরঙ্গিত। রবীন্দ্রউপন্যাসের অনেক চরিত্র স্পষ্ট তত্ত্বপ্রতিবিম্ব হয়েও তারা যে সজীব, চলমান ও সমগ্রতায় উদ্‌ভাসিত, এর অন্যতম কারণ উল্লিখিত অন্তর্লক্ষণ। 'চতুরঙ্গে'র চরিত্রাবলী এ-কারণে তত্ত্বসমূহের stylized figures এবং Psychological archetypes হওয়া সত্ত্বেও বেদনাময় চৈতন্যে, ভ্রান্তিমগ্ন উচ্চারণে, অনুভূতিময় দীর্ঘশ্বাসে, জীবনার্থ সন্ধানের রক্তাপ্লুত পদপাতে ও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির যন্ত্রণাদীর্ণ টানাপোড়েনে তারা মানুষ, ছিন্নভিন্ন চূর্ণ মানুষ ; আমাদের পূর্বপুরুষ।

---

১৬ 'পত্র সংখ্যা ১৯', ''চিঠিপত্র ৯'', পৃ. ৩৯-৪০

১৭ রবীন্দ্রনাথের অরূপ দেবতা অনুধ্যানের রন্ধ্রহীন শব্দহীন বহির্জগৎবিহীন পাষাণ 'দেউল'-ও বিদীর্ণ হয়েছিল বজ্রাঘাতে। ''একদা এক বিষম ঘোর স্বরে/বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।/ বেদনা এক তীক্ষ্ণতম / পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,/অগ্নিময় সর্পসম / কাটিল অন্তরে।/ বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।।/' 'দেউল', ''সোনারতরী'', (পুনরমুদ্রণ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৬), পৃ. ১১৭।। লক্ষণীয়, দামিনী ও বজ্র পরস্পরিত অর্থ-জ্ঞাপক শব্দ। শচীশও কবির মতো জগৎ-প্রকৃতি বিবর্জিত এক চিত্তদেউল গড়েছিল।

১৮ "Experience···is an immense sensibility, a kind of huge spider-Web of the finest silken threads suspended in the Chamber of conciousness, and catching every air-borne particle in its tissue. It is the very atmosphere of the mind ; and when the mind is imaginative—much more when it happens to be that of a man of genius—it takes to itself the faintest hints of life, it converts the very pulses of the air into revelations." 'The Art of Fiction', Henry James, *Selected Literary Criticism*, edited by Morris Shapira, (London : Penguin Books 1963), P. 85-86

দুই.

'চতুরঙ্গে' ঘটনা ও চরিত্রবিকাশ 'চোখেরবালি' কিংবা 'গোরা'র মতো কার্যকারণভিত্তিক নয়; এখানে ঘটনাবিকাশের ক্রমসংলগ্নতা অপসৃত, চিত্তপ্রবাহের পারম্পর্যও অনুপস্থিত। 'চতুরঙ্গে' চরিত্রচিত্তই মুখ্য, ঘটনার মূল্য গৌণ ১৯। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি জ্ঞান থেকে নির্জ্ঞানে, চেতনা থেকে অবচেতনায় প্রতিনিয়ত সঞ্চরণশীল। শ্রীবিলাসের চেতনাস্রোতে জাগরিত বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন মুহূর্তগুলির বিন্যস্ত শব্দরূপ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। ব্যক্তিসত্তা কোন অবিভাজ্য চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ নয়, এবং সে অভিব্যক্তি কার্যকারণ-শৃঙ্খলারহিত, এলোমেলো ও অস্থির। শ্রীবিলাসের বহমান চেতনানুষঙ্গে জেগে উঠা স্মৃতিপুঞ্জ ও ভাবাবেগসমূহের পরস্পর অসম্বদ্ধতা ও উল্লম্ফনধর্মিতা চতুরঙ্গের গঠনশৈলীতে অনিবার্য ভূমিকা পালন করেছে।

১. 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাসের চেতনাবাহী বিবরণে 'পরস্পরজড়িত দুটি কাহিনী বহমান'— একটি ভাবমুখ্য, শচীশের জীবন তার সংহতিবিন্দু; অপরটি জীবনমুখ্য, কথক শ্রীবিলাসের আত্মকথা তার কেন্দ্রমূল। জীবন আকাঙ্ক্ষী দামিনী দুর্নিবার শক্তিতে শচীশ ও শ্রীবিলাসের সঙ্গে সংলগ্ন। শচীশের জীবনকাহিনীতে বর্ণিল, প্রগাঢ় ও উত্তুঙ্গ পরিস্থিতিগুলি প্রাধান্য পেয়েছে, বর্ণিত হয়েছে তার জীবনজিজ্ঞাসার গভীরতম সংকট। পক্ষান্তরে শ্রীবিলাসের আত্মগোপনকারী আত্মকথায় ঔদার্য ও ঈর্ষা, প্রত্যাশা ও ব্যর্থতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রাত্যহিক মানবীয় প্রতিক্রিয়ার লঘু রেখাঙ্কিত জীবনচিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। এই দ্বিস্রোত পরস্পর মিলিত হয়ে সৃজন করেছে 'চতুরঙ্গে'র সমগ্রতা এবং এই সৃজন প্রক্রিয়ার চেতনাগত ঐক্য সূত্রে উন্মোচিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের জীবনবীক্ষার বহুলাঙ্গিক সম্পূর্ণতা।

২. শ্রীবিলাসের সত্তায় জেগে উঠা চেতনার উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি চতুরঙ্গে উদ্ভাসিত হওয়ায়, এ উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক ও পরিপ্রেক্ষিত অনুজ্জ্বল, ঝাপসা, অন্ধকারাচ্ছন্ন; কখনো বিলুপ্ত। এ উপন্যাসের দৃশ্যপট ও বস্তুপরিসরের বিশদ বিবরণ দুর্লভ, কখনো অনুপস্থিত। উদাহরণ হিসেবে চতুরঙ্গের যে কোন পরিচ্ছেদ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন :

> গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।
>
> গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই; ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

---

১৯ "চতুরঙ্গে"র 'জ্যাঠাশায়' শীর্ষক অংশ প্রকাশিত হয় সবুজপত্রে, অগ্রহায়ণ ১৩২১ সংখ্যায়; এর এক বৎসর পর অগ্রহায়ণ ১৩২২ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'মানবচরিত্রে যে-সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেই গুলিকেই ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই।' 'গ্রন্থপরিচয়', "রবীন্দ্র-রচনাবলী", অষ্টম খণ্ড, (পুনরমুদ্রণ; কলিকাতা বিশ্বভারতী ১৩৬০), পৃ. ৫২৪-২৫

> গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে শুরু করিয়াছে।[২০]

উল্লিখিত অংশে দামিনীর জীবনাচরণের তথ্য উপস্থিত, ভাবাবেগের চিত্রকল্প বর্তমান, কিন্তু দৃশ্যপরিসর ও দৃশ্যপটের কোন বস্তুগত বিবরণ নেই। প্রতিটি বর্ণনাবাহী পঙ্‌ক্তি ও ছবি শ্রীবিলাসের অন্ধকার চেতনার খরস্রোতে উজ্জ্বল রেখার মতো বেগবান ; কেবল এর উজ্জ্বল অংশই দৃশ্যমান ; অপরপক্ষে অদৃশ্য অন্ধকার তরঙ্গধ্বনি শোনা যায় মাত্র। অনুভববেদ্য তীক্ষ্ণ চিত্তবৃত্তিময় পাঠকের দায়িত্ব অনুভূত উদ্দীপন তরঙ্গ দিয়ে বিশদ দৃশ্যপট ও তার স্থানবর্ণিমা গড়ে তোলা।

বিক্ষিপ্তভাবে কখনো কখনো দৃশ্যপটের কিংবা বস্তুপরিসরের কিছু বিবরণ-আভাস ধাক্কা খেয়ে চেতনার উজ্জ্বল অংশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ; তা থেকে পরিপ্রেক্ষিতের পরিসীমা অনুমান করা যায়। যেমন :

> ক. শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এন্‌ট্রেন্‌স্ স্কুলের হেড্‌মাস্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন আর পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।[২১]
>
> খ. এমন সময় শোনা গেল, চাটগাঁয়ের কাছে কোন এক জায়গায় শচীশ, আমাদের শচীশ, লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।[২২]
>
> গ. গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।[২৩]
>
> ঘ. কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম—চটক ভাঙিয়া গেল। একদিন এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি ; গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি ; রাষ্ট্রনৈতিক সন্মিলনীতে ভলান্‌টিয়ারি করিয়াছি ; পুলিশের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছে ;—ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায় পাক খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায়

---

২০ দামিনী ১, 'চতুরঙ্গ', "রবীন্দ্র-রচনাবলী", সপ্তম খণ্ড, (পুনরমুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৭) পৃ. ৪৬১

২১ জ্যাঠামশায় ৪, ঐ, পৃ. ৪৩৮

২২ শচীশ ৩, ঐ, পৃ. ৪৪৯

২৩ শচীশ ৪, ঐ, পৃ. ৪৫০

> অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।[২৪]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের বর্ণনা-সংস্থান স্কেচধর্মী ও অসম্বন্ধ নিঃসন্দেহে, তবুও এই মিত-কথনের ভগ্নাংশ দিয়েই 'চতুরঙ্গের' পরিপ্রেক্ষিতের পরিসর ও ব্যাপ্তির প্রতিস্পন্দন অনুভব করা যায়; মনোগ্রাহ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলা সম্ভব এর আকল্প ও আকৃতি।

৩. শ্রীবিলাসের চেতনাস্রোতে জাগরিত স্মৃতিঅনুষঙ্গ 'চতুরঙ্গে' সংস্থিত হওয়ায়— এ উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস পারম্পর্যবিহীন, ভঙ্গক্রম ও কার্যকারণ বহির্ভূত। প্রথানুগত কার্যকারণভিত্তিক বিকাশধর্মী উপন্যাস হলে, জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশের লীলানন্দ স্বামীর দলে যোগ দেবার মানসিক স্তরসমূহের বিশদ বিশ্লেষণ, শচীশ-দামিনীর স্তরবহুল সম্পর্কের উন্মেষ ও বিকাশের চিত্র অঙ্কন এবং শচীশের পরিণামী সংশ্লেষে উত্তরণের কার্যকারণ প্রতিপাদন করা অনিবার্য ছিল। 'চতুরঙ্গে' এ সবের ছিন্ন সংকেত আছে, বিস্তৃত বিবরণ নেই। বস্তুতঃ শ্রীবিলাসের বিশৃঙ্খল চেতনাপ্রবাহের সঙ্গে 'চতুরঙ্গে'র এই উল্লম্ফনধর্মী বিন্যাসরীতি অসঙ্গত নয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে 'চতুরঙ্গ' শ্রীবিলাসের চেতনাবাহী স্মৃতিময় অনুষঙ্গ। স্মৃতি কখনো ক্রমানুসারে প্রত্যুজ্জীবিত হয় না—ফলে এ উপন্যাসের ঘটনাসংস্থানও ভঙ্গক্রমিক। ঘটনার অগ্রগমন স্থলে প্রতীপগমনও দুর্লক্ষ্য নয়। কখনো পরবর্তী ঘটনা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। 'শচীশ১'[২৫] পর্যায়ে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুসংবাদ প্রথমে লিপিবদ্ধ করে, ঔপন্যাসিক অতঃপর তার বিবরণ দিয়েছেন। এ বৈশিষ্ট্য আরো তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হয়েছে শ্রীবিলাস অংশের প্রথমে:

> এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।[২৬]

এই ভগ্ন নীলকুঠির সম্মুখে সিসু গাছের ছায়ায় শ্যাতলা পড়া ইঁটের ঢিবির উপর বসে নিঃসঙ্গ শ্রীবিলাস একদিন আবেগাপ্লুত হয়, ভাবে; তখন বাতাসে ভেসে আসছে ধনে ফুলের গন্ধ। এই ভাবনাস্রোতে ক্রমোজ্জ্বল হয়ে ভেসে আসে 'শ্রীবিলাস অংশের' আনুষঙ্গিক চেতনাপুঞ্জ ও ঘটনাবলী। এ অংশের অন্তিমে দামিনীর মৃত্যুর প্রগাঢ় বিবরণ আছে, সেখানেই এ উপন্যাসের শেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সমাপ্তি[২৭] প্রকৃতির একান্তবর্তী শ্রীবিলাসের নৈঃসঙ্গ্য ও বেদনাব্যঞ্জনায়; জীবনবঞ্চিত শ্রীবিলাসের স্থির একাকিত্বে।

৪. চরিত্রসমূহের ব্যক্তিস্বরূপ ও তাদের আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ, ঘাত-প্রতিঘাতময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানস-পরিবর্তনের বিবরণ কিংবা বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিক 'চতুরঙ্গে' বর্জন

২৪ শচীশ ৫, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩

২৫ শচীশ ১, ঐ, পৃ. ৪৪৭

২৬ শ্রীবিলাস, ঐ, পৃ. ৪৭৮

২৭ শ্রীবিলাস, ঐ, পৃ. ৪৭৮-৭৯

করেছেন। মূলতঃ চেতনায় সমুজ্জ্বল প্রগাঢ় মুহূর্তগুলি রূপময় গীতময় হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার বিকল্পে সে সব মনোভাব ও অভিব্যক্তি উদ্ভাসিত হয়েছে প্রধানতঃ সংকেতব্যঞ্জনায়, বিবরণের গীতলতায় ও প্রতীকধর্মিতায়। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য শ্রীবিলাসের পরিপ্রেক্ষণ বিন্দু থেকে পাঠকচিত্তে ভাবানুষঙ্গ জাগিয়ে তাঁদের চেতনাবেগ আলোড়িত করা। যেমন :

ক. 'শচীশ৭' এর শেষে দামিনীর তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবনযন্ত্রণার উন্মোচনে ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণধর্মিতা পরিহার করে দৃশ্যবদ্ধ এক আবেগপূর্ণ পরিস্থিতি সৃজন করেছেন :

> একদিন শীতের দুপুর বেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, "পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।"[২৮]

খ. 'শচীশ৯' এর শেষে শচীশের প্রতি দামিনীর আত্মনিবেদনের মনোভাব বিশ্লেষিত কিংবা বর্জিত হয়নি, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়েছে :

> স্বামী (লীলানন্দ) যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল; অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।[২৯]

গ. ঔপন্যাসিক চরিত্রভাব প্রকাশে কখনো কখনো নির্দিষ্ট চরিত্রের শরীরী অভিব্যক্তি ও আচরণের অলঙ্কারযোজিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। পাঠক চিত্তে একটা অনুভূতিময় অর্থ সঞ্চার করা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য, যেমন :

> দামিনীর এলো খোঁপা-বাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইশারা দেখা যাইতেছে।[৩০]

কিংবা অন্যত্র :

> দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের একি চেহারা! প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা। চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।[৩১]

---

২৮ শচীশ ৭, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৭

২৯ শচীশ ৯, ঐ, পৃ. ৪৫৯

৩০ দামিনী, ঐ, পৃ. ৪৬১

৩১ দামিনী ৪, ঐ, পৃ. ৪৭২-৭৩

'ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল' জাহাজ দেখে যেমন দুর্যোগের ভয়াবহতা ও ঝড়ের তীব্রতা অনুভব করা যায়, তেমনি বিধ্বস্ত অবয়ব শচীশের অনুষঙ্গে পাঠক চিত্তে জেগে ওঠে উপন্যাসে অবর্ণিত তার দ্বন্দ্বজীর্ণ অন্তর্জগতের বিপন্ন ইতিহাস।

ঘ. নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর দৃপ্ত দামিনীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক শচীশের মনোভাব ও প্রকৃতি, শব্দে ও নৈঃশব্দে ঐকাত্ম্য করে গূঢ় সাংগীতিকতায় পরিব্যাপ্ত করেছেন :

> সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূর-সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।[৩২]

ব্যাখ্যা, বিবরণ কিংবা বিশ্লেষণ নয়, এখানে বেদনার্দ্র অনুষঙ্গচিত্র সংস্থান-ই ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য।

ঙ. লীলানন্দ স্বামীর জীবনবিরুদ্ধ অধ্যাত্মরস সাধনার কেন্দ্রবর্তী হয়েও দামিনী বিপ্রতীপগামী। তার এ মানসিকতা উন্মোচনে বিবরণধর্মী কিংবা বিশ্লেষণাত্মকরীতি পরিহার করে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন দামিনীর আবেগঘনিষ্ঠ একাধিক প্রতীক; যেমন 'আহত চিল', 'কুকুর ছানা', 'বেজী', 'ফুলগাছ' ইত্যাদি। 'চতুরঙ্গে' এসবের বিন্যাসগত সূক্ষ্ম বিপরীতাভাস গভীর তাৎপর্যবহ। যেমন :

> গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন-দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল; সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে; তারপর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।[৩৩]

বস্তুজগৎ ও দামিনীর মন—এ দুয়ের বাস্তবতা একাত্ম হয়ে উদ্ধৃতাংশে এক তৃতীয় মাত্রা উদ্ভাসিত হয়েছে। আহত চিল যেন স্বামী শিবতোষ প্রদত্ত শাস্তিশাসিত দামিনীর জীবন, লুব্ধ ক্রুর কাকের দল যেন লীলানন্দ স্বামীর সম্প্রদায়। দামিনীর জীবনমুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপরিউদ্ধৃত দৃশ্যপরিসরে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। অন্যত্র :

> একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন।"
> "কোন্‌খানে।"
> "গুরুজির কাছে"
> "কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন।"
> "প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে।"
> দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "কিছু না, কিছু না!"[৩৪]

---

৩২ দামিনী ৩, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৯

৩৩ দামিনী, ঐ, পৃ. ৪৬২

৩৪ দামিনী, ঐ, পৃ. ৪৬৩

প্রতিবাদে দামিনীর জ্বলে উঠা আকস্মিক নয়। এর অবিশ্লেষিত কার্যকারণ ফুলগাছ চর্চার প্রতীকে অর্থাৎ দামিনীর প্রবল জীবনাগ্রহের মনস্তত্ত্বে নিহিত। ফুলগাছ চর্চার জন্য উপন্যাসে 'ভাঙা হাঁড়ির' ব্যবহার ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও নির্ভুল প্রতীক উদ্ভাবনাশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনবঞ্চিত ও শচীশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দামিনীর জীবনাগ্রহে এবং 'ভাঙাহাঁড়ি'তে ফুলগাছের চর্চা ঐকান্তিক অন্তঃসঙ্গতিতে প্রতিসম। 'ভাঙা হাঁড়ির' আর কোন অনুকল্প অসম্ভব।৩৫

চ. 'শচীশ১০' পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর আত্যাধুনিকতার স্বাক্ষর। অবচেতনায় অনুভূত অন্ধকারের সীমারেখাহীন দৃশ্যপটে জেগে ওঠা কিছু বিকল ভগ্ন প্রতীকী চিত্র—শচীশের মনোভাবকে চেতনাগ্রাহ্য পরাবাস্তববাদী সত্যে উদ্ভাসিত করেছে :

> সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো—তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই—সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে, সে নিঃশব্দে কাঁদে।
>
> ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিম্বা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ্ ঝপ্ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।---
>
> মনে হইল, সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।---জানি না কতক্ষণ পরে, সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়, অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা! তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম, কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁওয়া আছে, এর রোঁওয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।
>
> ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল, সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে—

---

৩৫ ফ্লবেয়ারের উক্তি স্মরণীয়—"বক্তব্যের কোনো বস্তুর রূপ প্রকাশ করার উপযোগী মাত্র একটি কথাই আছে; সেই বস্তুর গতির রূপ প্রকাশ করবার উপযোগী মাত্র একটি ক্রিয়াপদই আছে; এবং তার গুণ বোঝাবার জন্য মাত্র একটি বিশেষণই আছে।" উদ্ধৃত, 'সাহিত্যের ভাষা', শ্রীসুবোধ ঘোষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩ : ১, (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৬৬৩), পৃ. ১২

> ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।
>
> অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, তার গায়ে রোঁওয়া নাই; কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে।
>
> ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।
>
> অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না।[৩৬]

শচীশের সচেতন মনে দামিনী ছিল প্রকৃতির চর রূপে অধ্যাত্মসাধনার প্রতিবন্ধক; ইন্দ্র প্রেরিত মূর্তিমান মোহ। সজ্ঞানতাজাত উপেক্ষার প্রবল চাপে শচীশের অবচেতন স্তরস্তরে দামিনী ও তার প্রণয় রূপ পায় বিচরণশীল আদিম প্রতীকে। গভীর রাত্রে অন্ধকার গুহায় দামিনীর আত্মসমর্পণের অভিঘাতে শচীশের অর্ধসজাগ চেতনায় জেগে ওঠে সমাচ্ছন্ন সে সব প্রতীকীভাবনা। দুর্গম সমুদ্রতীরের অজ্ঞাতপ্রায় গুহার অন্ধকারে 'আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু'—মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যৌনচেতনার সংগে অর্থময়তায় হয়েছে ঐকাত্ম্য। শচীশের নিবৃত্তিসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব অর্ধচেতন প্রতীকীকল্পনা হয়েছে ঐকান্তিক ও সমার্থক। বস্তুতঃ, 'অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না'—বাক্যত্রয় পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকচিত্তে বিদ্যুল্লতার মতো জেগে ওঠে বেদনার্ত বিকিরণ—উজ্জ্বল হয় গুহা; দেখা যায় দামিনী তার দ্বিধা-লজ্জা-তেজ সব প্রণয়াবেগে জলাঞ্জলি দিয়ে অর্ধসজাগ শচীশের পায়ে প্রণাম করছে নীরব হাহাকারে, আর শচীশ তাকে পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করছে বারংবার। প্রকৃতপক্ষে, নিরাকার মগ্নচৈতন্যের রূপাঙ্কনে, ইন্দ্রিয়ানুগত ভাষার বিষয়ানুগ সৌকর্যসাধনে ও পরিমিতিবোধের সূক্ষ্মতায়— এ অংশ 'চতুরঙ্গে'র শিল্পোৎকর্ষের শীর্ষবিন্দু।

৫. 'চতুরঙ্গে' বস্তুজগতের ত্রিমাত্রিক অবয়ব যথাযথভাবে অঙ্কিত হয়নি। বর্ণনায় ও বিবরণে চরিত্রসমূহের অন্তর্জাগতিক বিচ্ছিন্ন অনুভূতিপুঞ্জ পরস্পরিত আবেগে বিষয়াশ্রয়ী করে তোলাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। চতুরঙ্গের বর্ণনা সাংকেতিক শব্দ সমবায়ে হয়েছে পরমার্থিক; আবার কোথাও বস্তুসংস্থান ও মনোভাবের অন্তর্বয়নে বর্ণনাংশ পেয়েছে লোকোত্তর পরিব্যাপ্তি। যেমন বালুচরের বর্ণনা :

> চারিদিক ধূধূ করিতেছে; জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।
>
> যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না', তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন

---

৩৬ শচীশ ১০, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯-৬০

> হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।[৩৭]

উপরিউদ্ধৃত ভূদৃশ্য বর্ণনা যুক্তিনিষ্ঠ নয়; এবর্ণনার বহিরঙ্গ ভেঙে, বেঁকে, ছিঁড়ে সৃষ্ট হয়েছে আর এক চেতনানুগত বাস্তব। দামিনীর ব্যর্থ ও শূন্য জীবনের চেতনাময় প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ফ্যাকাশে সাদা রঙে অঙ্কিত ভাবানুষঙ্গিক সীমারেখাহীন এ চিত্র মূলতঃ মনোময়, এবং তা দামিনীর মরু-হৃদয়ের প্রতিবিম্বপাত। দামিনীর জীবন তো প্রচণ্ড 'না'-এর উপর দিয়ে অগ্রসর হওয়া। এ বর্ণনা আবেগ, ভাবানুষঙ্গ ও সংকেত প্রভাবিত শব্দ চিত্র, এবং দৃশ্যটি সমগ্র চেতনায় দামিনীর শূন্যপরিণতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশক। অন্যত্র :

> সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারি একটা ঝড় আসিল।...নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচছল্ আর আকাশের জলের ঝর্ঝর্ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম্ করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানারকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ্ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়্মুড়্ দুড়্দুড়্ করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বারবার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হুহু করিয়া চীকার করিতেছে।[৩৮]

ঝোড়ো রাতের এ বর্ণনাও শ্রীবিলাসের উৎকণ্ঠাময় চেতনাগত, এবং তা সৃজিত হয়েছে ভাবানুষঙ্গের সাংকেতিক শব্দ সমবায়ে। আবেগ, অনুভববেদ্য হৃদয়ের সংরাগ ও অন্তর্জগতের অবদমিত রোদন উৎসারিত কালো রঙের এ-শ্রাব্যকল্প প্রতীকী পরামার্থে দূরসঞ্চারী।

তিন.

১. বাংলার মেকলে, বাংলার জনসন বলে কথিত, ম্যাল্থস পড়া, বিপত্নীক ও নিঃসন্তান জগমোহন অর্থাৎ শচীশের জ্যাঠামশায়ের জীবনকথা 'চতুরঙ্গে'র প্রথম পর্বের বিষয়বস্তু। শচীশ-চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট হিসেবে জ্যাঠামশায়ের ভূমিকা এ উপন্যাসে পরিণামসঞ্চারী। জীবনাদর্শে জ্যাঠামশায় পজিটিভিস্ট। বাংলাদেশের বিদগ্ধ মহলে উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমপাদে কোঁৎ-মিলের প্রভাবজাত মানবতাবোধের আইডিয়া ছিল তীব্র। সেকালে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৬-১৮৭৪) আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২), ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬), শোনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ ধ্রুবদর্শনে

---

৩৭ **শ্রীবিলাস ২, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩**

৩৮ **শ্রীবিলাস ৪, ঐ, পৃ. ৪৮৭**

৩৯ বিপীনবিহারী গুপ্ত, "পুরাতন প্রসঙ্গ", (১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায় একত্রে : বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১৩৭৩), পৃ. ১০১, ৩১২-১৩

(Positivism) বিশ্বাসী ছিলেন।[৩৯] তাঁদের কাছে ঈশ্বর অজ্ঞেয়, প্রত্যক্ষ মানুষই ঈশ্বর। জগমোহন ঈশ্বর বিশ্বাসে নাস্তিক হলেও, জীবনদর্শনে আস্তিক, মানবতাবাদী। মানবধর্ম ও মানুষের সেবায় তিনি নিরলস সাধক। কোঁতের মতো তিনিও Humanity-intoxicated Man[৪০] ; মানুষ তাঁর দেবতা ; হরিমোহনকে তিনি বলেন :

> ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি, তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।---
>
> হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না।[৪১]

এই জগমোহন বন্ধুর মতো প্রাত্যহিক সান্নিধ্যে শচীশকে পজিটিভিস্ট হিসেবে গড়ে তোলেন। স্বর্গের লোভ কিংবা নরকের ভয়ে নয়, নাস্তিক এ অহংকারেই তিনি নিরঞ্জন চরিত্রের অধিকারী। জগমোহন নির্লোভ, সৎ ও সত্যবাদী—প্রতিনিয়ত সততার বলেই সকল প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী। তাঁর মৃত্যুও ঘটে প্লেগাক্রান্ত চামার মুসলমান দেবতার সেবা করতে গিয়ে। তদ্‌সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক প্রত্যক্ষবাদী জগমোহনের জীবনের ব্যর্থতা দেখিয়েছেন দু'ভাবে—প্রথমতঃ ননীবালার আত্মহত্যা ; দ্বিতীয়তঃ তাঁর মৃত্যুর পর পজিটিভিজম্-এ দীক্ষিত শচীশের মানববিকেন্দ্রিক রসবাদী অধ্যাত্মসাধনায় নিমজ্জন। জগমোহনের জীবনদর্শনের পরাজয়ের কারণ—'মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা-গণনায় যে মানুষটা কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত।[৪২]

প্রত্যক্ষ মানুষকে 'হাঁ' হিসেবে স্বীকার করে, সকল অপ্রত্যক্ষে 'না' বিশ্বাস যে পরম কল্যাণকর নয়, জগমোহনের জীবন তার দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে লীলানন্দ স্বামীর রসসাধনার ব্যর্থতাও ঔপনাসিক দেখিয়েছেন দ্বিবিধ পদ্ধতিতে—প্রথমতঃ নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা ; দ্বিতীয়তঃ তাঁর রসসাধনার কেন্দ্রবর্তী দামিনীর অরূপধ্যানে অবিশ্বাস ও

---

৪০ Thomas a Kempis গ্রন্থের যে যে স্থানে ভগবানের নাম করিয়াছেন, কোঁৎ সেই সেই স্থানে Humanity এই শব্দটি বসাইতে বলেন।···Kempis যেমন ভগবানে বিভোর, কোঁৎ তেমনি Humanity লইয়া বিভোর। ভগবদ্ভক্ত যেমন ভগবানের হস্তচিহ্ন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে পান, কোঁৎ তেমনি আহার, আচ্ছাদন, বাড়ী, ঘর, আইন, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল সর্ব্বত্র Humanity-র হস্তচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া গদ্‌গদ হইয়া যাইতেন এবং আনন্দ পরিপ্লুতভাবে তাহা কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। সুইডেনবর্গকে লোকে বলিত God-intoxicated man—কোঁৎকে তদ্রূপ বলা যাইতে পারে, Humanity-intoxicated man—'' 'আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা (প্রথম স্তবক)', ''পুরাতন প্রসঙ্গ'', পৃ. ৮৪

৪১ জ্যাঠামশায় ৩, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬

তুলনীয় : ''আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়,---বৈকুণ্ঠেও নয়,—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে—সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়।'' 'পত্র সংখ্যা ১৯', ''চিঠিপত্র ৯'', পৃ. ৪২

৪২ জ্যাঠামশায় ৪, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮

তার জীবনপিপাসা। জীবনবিবিক্ত অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরসাধনায় নিমজ্জন যে জীবনমুক্তি নয়, লীলানন্দ স্বামীর উল্লিখিত ব্যর্থতা তার প্রমাণ। একদিকে জগমোহনের 'হাঁ', অপরদিকে লীলানন্দ স্বামীর 'না'—এই দুই চরম পদ্ধতিসর্বস্ব যান্ত্রিক জীবনের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত শচীশের সংশ্লেষমূলক জীবনার্থে উত্তরণ 'চতুরঙ্গে'র মূল কথা।

২. 'শামুকের খোলার মতো ইংরেজি বই দিয়ে ঘেরা' পজিটিভিস্ট জ্যাঠামশায়ের স্নেহে ও আদর্শে[৪৩] গড়ে ওঠে গোঁড়া-হিন্দু হরিমোহনের পুত্র শচীশ। কালক্রমে ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্য শচীশের 'মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।'[৪৪] মানবতাই তার ঈশ্বর, এবং এই মনুষ্যত্বের অবমাননা বিবেচনা করেই শচীশ লাঞ্ছিত ননীবালাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধনে'র প্রেরণা এর মূল কারণ, হৃদয়ানুভূতির অনিবার্যতা নয়। শচীশেরও দেবতা মানুষ, সেও জ্যাঠাশমশায়ের সঙ্গে প্লেগাক্রান্ত চামার মুসলমানের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে। পজিটিভিস্ট শচীশের নির্দ্বন্দ্ব জীবন প্রথম জিজ্ঞাসাবিদ্ধ ও দোলাচলে বিপন্ন হয় জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুজনিত যন্ত্রণাবোধে :

> ---জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমন তরো ঠেকিয়াছিল তা-ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না ; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই ; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।[৪৫]

শচীশ তার হৃদয়ের শূন্য গহ্বর পূর্ণ করে তুলতে যোগ দেয় লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনের দলে। পরম নাস্তিক হয়ে ওঠে চরম আস্তিক, অরূপ সাধক, নির্দ্বন্দ্ব রূপক বিলাসী। মানুষ তার কাছে আর রক্তমাংস নয়, আইডিয়া বিশেষ।[৪৬] আজ শচীশের বিশ্বাস :

> জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন ; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে,---। এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাইতো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারিদিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন —আমি পা টিপিয়া পার পাইতেছি।[৪৭]

---

৪৩ "জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতেও পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়।"—শচীশ ২, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৮

৪৪ জ্যাঠামশায় ২, ঐ, পৃ. ৪৩৩

৪৫ শচীশ ২, ঐ, পৃ. ৪৪৮

৪৬ 'বুঝিলাম, শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারে নাই। মিলনমাত্র যে-আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি 'সর্বভূত' ; সে-আমি একটা আইডিয়া।' শচীশ ৪, ঐ, পৃ. ৪৫২

৪৭ শচীশ ৪, ঐ, পৃ. ৪৫১

চট্টগ্রামের গ্রাম-গ্রামান্তরে ভাসমান লীলানন্দ স্বামী শচীশ-শ্রীবিলাস সহ, এসময় কিছু দিনের জন্য তাঁর পরলোকগত শিষ্য শিবতোষের কলকাতার বাড়ীতে এসে ওঠেন। এখানেই শচীশের নীরন্ধ্র অধ্যাত্মবিশ্বাস, জীবনবর্জিত আইডিয়া প্রথম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হয়। শিবতোষের বিধবা স্ত্রী, 'জীবন রসের রসিক' দামিনী তার প্রণয়াবেগে শচীশকে আকর্ষণ করে মর্ত্যের দিকে, রূপের সীমানায়। অতঃপর দুর্গম সমুদ্র-তীরের গুহার অন্ধকারে দামিনী নিজেকে সমর্পণ করে শচীশের পায়ে। যন্ত্রসুলভ অমোঘ ক্রূরতায়, ঘৃণায় আক্ষিপ্ত শচীশ তাকে পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করে। গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন করে শচীশ পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে কীর্তন শুরু করে। একদিন সে শ্রীবিলাসকে বলে, "দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না," কারণ :

> ---মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই-সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।[৪৮]

স্পষ্টতঃই বুঝা যায় দামিনীর বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ আত্মনিবেদনে শচীশের অন্তরে জন্ম নিয়েছে এক নিগূঢ় সংক্ষোভ। এরপর শচীশের জীবনে শুরু হয় প্রকৃতির চর দামিনীর প্রণয় প্রতিরোধের আত্মবিনাশী সংগ্রাম। শচীশের সত্তায় জাগে দুর্নিবার ঘূর্ণিঝড়, চেতনায় উচ্ছ্বসিত হয় তীক্ষ্ণ বেদনাবর্ত; শচীশ ক্রমশঃ হয়ে ওঠে 'যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো—এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া আর দেরি নাই।'[৪৯] শচীশ মূলতঃ তার মানসিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য পলায়ন করে দূর সমুদ্রের ধারে। কিন্তু সে নির্জনতায় তার চিত্তগভীরে দামিনীর প্রতি আত্ম-গোপনকারী প্রণয়াবেগ তাকে করে আত্মহারা, উন্মূলিত; কয়েকদিনের মধ্যেই শচীশ ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো দামিনীর দরজায় মুখ থুবড়ে পড়ে :

> দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম—আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।[৫০]

অতঃপর শচীশ দামিনীর প্রণয়, রূপ ও রূপকসাধনাকে ঐকাত্ম্য করে সংকটোত্তীর্ণ হতে চেয়েছে। কিন্তু জীবন তো তত্ত্বের জোড়া-তালি দেয়া প্রতারণা অনুমোদন করে না। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা প্রকটভাবে প্রমাণ করে রসসাধনার অন্তঃসারশূন্যতা। একদিকে দামিনীর বেদনার্ত আহ্বান, অপর দিকে নবীনের স্ত্রীর মৃত্যু—এই যুগ্ম প্রতিক্রিয়ায় শচীশের জীবনে দেখা দেয় পুনর্জাত হবার অন্তর্জ্বালাময় অস্থিরতা। প্রশ্নজর্জরিত, দ্বিধাবিদ্ধ ও অমীমাংসিত শচীশ বলে :

> একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম; দেখিলাম, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম; দেখিলাম, সেখানে

৪৮ দামিনী ৩, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

৪৯ দামিনী ৪, ঐ, পৃ. ৪৬৯

৫০ দামিনী ৪, ঐ, পৃ. ৪৭৩

> তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে দাঁড়ানো চলে না।[৫১]

শচীশ, শ্রীবিলাস ও দামিনী লীলানন্দ স্বামীকে পরিত্যাগ করে আশ্রয় নেয় এক পোড়ো বাড়ীতে। শচীশের জীবনে শুরু হয় আত্মপোলব্ধির যন্ত্রণাময় অধ্যায়। সে বলে :

> আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি...আর-সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টি ভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমি তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।[৫২]

শচীশ অগ্রসর হয় কঠোর সাধনার পথে। সে শ্রীবিলাস ও দামিনীকে পরিত্যাগ করে, পাঠিয়ে দেয় কলকাতায়। সে হয় নিঃসঙ্গ, নির্জনচর। নৈঃসঙ্গ্যের পরিমণ্ডলে, আন্তর-অভিজ্ঞতার পথে শচীশ ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হয় তার 'হাঁ' এবং 'না'-র সংশ্লেষণীতে, তার স্বোপার্জিত গভীরতম বোধে।

> সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কী মানিল আর কী না-মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল। আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।[৫৩]

৩. ধনবান পাটের ব্যবসায়ী অন্নদাপ্রসাদের কন্যা দামিনী। ঘটনাক্রমে সংসারবিমুখ শিবতোষের সংগে তার বিয়ে হয়। এ সময় শিবতোষ জীবনমুক্তির আশায় লীলানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে। জীবনপিপাসু দামিনীর মনের কামনা-বাসনার মূল উৎপাটনের সর্বপ্রকার চেষ্টা চলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তার গহনা পর্যন্ত শিবতোষ লীলানন্দ স্বামীর পায়ে সমর্পণ করে। দামিনী এসব মানসিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। এমন সময় শিবতোষ মরণকালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শাস্তিস্বরূপ সমস্ত সম্পত্তিসহ দামিনীকে গুরুর হাতে সমর্পণ করে যায়।

বস্তুতঃ, দামিনীর জীবনপিপাসার দুর্নিবার তীব্রতা ও প্রণয়াবেগের তীক্ষ্ণতার অনিবার্য প্রেক্ষাপট রচনা করেছে তার অচরিতার্থ শুষ্ক, বঞ্চনাময় দাম্পত্য ইতিহাস। এই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সজাগ থাকলেই দামিনীর দীপ্ত ও সাহসী আচরণের গভীরতর অর্থ স্পষ্ট হয়। কলকাতার বাসায় শচীশকে দেখে 'জীবনরসের রসিক' বিধবা দামিনীর ব্যর্থ জীবন, অবদমিত তৃষ্ণা চরিতার্থতা খোঁজে; মুমূর্ষু জীবন পল্লবিত হয়। কিন্তু শচীশ তো রূপকের

---

৫১ শ্রীবিলাস, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮০

৫২ শ্রীবিলাস ২, ঐ, পৃ. ৪৮২

তুলনীয়: "...বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর-কাহারো কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি নাই। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি।"
---'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', "চারিত্রপূজা", পৃ. ৯৭

৫৩ দামিনী: পরিশিষ্ট, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৭

ধ্যানে উন্মত্ত, জীবন-অন্ধ ; রূপ তার কাছে ঘৃণ্য। তবুও দামিনী পরাভব মেনে নেয় নি, কারণ :

> দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।[৫৪]

এ বছর শচীশের প্রতি অনিরুদ্ধ প্রণয় আকর্ষণে লীলানন্দ স্বামী ও তাঁর অনুচরদের সঙ্গে দামিনী দুর্গম সমুদ্রতীরে ভ্রমণে যায়। তার দীর্ঘকালের বেদনার্ত স্বপ্ন ও শিলীভূত আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত হয় ; সে রাতের অন্ধকারে গুহায় নিজেকে সমর্পণ করে শচীশের পায়ে। নির্মম লাঞ্ছনায় প্রত্যাখ্যাত হয় দামিনী।

গুহা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যাখ্যান-তাড়িত দামিনীর মানসিক রূপান্তর ঘটে, সে হয়ে ওঠে আরো দীপ্ত, কঠোর ও নীরব প্রতিবাদী। দামিনী গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে মিশে সংসারভাবনায় মগ্ন হয় ; আহত চিলের শুশ্রূষা করে ; ব্যস্ত হয় কুকুর ছানা, বেজী লালনে ; মনযোগী হয় ফুলগাছের পরিচর্যায়। আত্মসচেতন দামিনী জানে শ্রীবিলাস তার প্রতি গোপন প্রণয় লালনকারী। সে শ্রীবিলাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে শচীশকে ঈর্ষাচঞ্চল করে তুলতে চায়। দামিনীর আঘাতে শচীশ যন্ত্রণায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় বটে, তবে সে পথ দামিনীমুখী নয়। ঝড়বৃষ্টিমুখর রাতে দামিনী তার উৎকণ্ঠাদুঃসহ মানসিকতা ছিন্ন করে শচীশের ঘরে যায় জানালা বন্ধ করতে। সে রাতেই শচীশ দামিনীকে বলে :

> "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"
>
> দামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল। তারপরে বলিল, "তাই আমি যাইব।"[৫৫]

দামিনীর জীবনাগ্রহের প্রবল সংঘাতে শচীশ যেমন ঈশ্বরোপলব্ধির নির্ভুল পথের সন্ধান পায়, তেমনি শচীশের বেদনাময় তপস্যালোকে দামিনীও পৌঁছায় নতুন জীবনার্থে। দৃপ্র দামিনী হয়ে ওঠে দীপ্তিময়। সে শচীশকে তার গুরুর মর্যাদা দিয়ে শ্রীবিলাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে কলকাতায়। দামিনী উপলব্ধি করে শচীশের প্রেম পাওয়া সম্ভব, কিন্তু শচীশকে পাওয়া অসম্ভব ; শচীশ তার অসম্ভবের এলাকা। শচীশের প্রেম অরূপের দিক—এ সত্য জেনেই স্মৃতিময় দামিনী শ্রীবিলাসকে বিয়ে করে রূপের জগতে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। দামিনীর মৃত্যুমুহূর্তের সংলাপেও সম্পূর্ণতা উৎসারিত প্রশান্ত আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হয়েছে :

> যে দিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"[৫৬]

---

৫৪ শচীশ ৬, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪

৫৫ শ্রীবিলাস ৪, ঐ, পৃ. ৪৮৮

৫৬ শ্রীবিলাস ৫, ঐ, পৃ. ৪৯৬

'চতুরঙ্গে' শচীশ-দামিনীর সংবেদনাময় পথ চলা ও দ্বন্দ্বজীর্ণ নীরব হাহাকার আছে সত্য, তবে পরিণতিতে দুজনেই ধ্রুবসত্য মহিমায় উন্নীত। ভিন্নার্থক হলেও তাদের দুজনেরই প্রাপ্তিপর্ব আছে। তারা দুজনেই নবতর উপলব্ধিতে ও প্রশান্তিময় পরিমণ্ডলে পুনর্জাত হয়েছে। যন্ত্রণাদীর্ণ শচীশ-দামিনীর উৎকণ্ঠাদুঃসহ অগ্নিময় পথ পরিক্রমা ও পরিণামে নবজাত হবার শিল্পিত ইতিকথা চতুরঙ্গ। কিন্তু নিগূঢ় অর্থে এ উপন্যাস শ্রীবিলাসের ট্র্যাজেডি।

৪. 'চতুরঙ্গে'র কথক শ্রীবিলাসের আত্মকথা জীবনধর্মী; সে তত্ত্বচালিত নয়, জীবনময়। রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীবিলাসের সঙ্গে শচীশের বন্ধুত্ব হয় কলেজ জীবনে। শ্রীবিলাস তখন ঈশ্বরবিশ্বাসী ও সংস্কার আচ্ছন্ন।

> ---শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতিহিসাবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন-কি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।[৫৭]

শচীশকে বন্ধু হিসেবে ভালোবেসে, জ্যাঠামশায়ের সান্নিধ্যে এসে আস্তিক শ্রীবিলাস ক্রমশঃ হয়ে ওঠে নাস্তিক। শ্রীবিলাসও জগমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে; হয়ে ওঠে নামজাদা পজিটিভিস্ট। সেও জ্যাঠামশায়-শচীশের সঙ্গে মানবের সেবা করে, দেশের কথা ভাবে, পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ করে। সেও প্লেগাক্রান্ত মুসলমান দেবতার সেবায় যোগ দেয়।

এ সময় জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর নিরুদ্দেশ হয় শচীশ। শ্রীবিলাস তাদের দল নিয়ে অধিক আগ্রহ ও উদ্যমে সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করে। বছর দুয়েক পর শ্রীবিলাস শচীশকে খুঁজে পায় চট্টগ্রামের এক গ্রামে; সে তখন লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য। শচীশের আকর্ষণে সে লীলানন্দ স্বামীর দলে থেকে যায়। লীলানন্দ স্বামী ও শচীশের রস-সাধনাকে শ্রীবিলাস মুহূর্তেও মেনে নেয়নি। তাদের আইডিয়া-বিহারী তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীবিলাসের মনোকথন লক্ষণীয়:

> এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে-জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্, আমার তো নাই; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না—আমি যে আমি।[৫৮]

শ্রীবিলাসের এই বিরুদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও লীলানন্দ স্বামীর দল ত্যাগ না করার দ্বিতীয় কারণ দামিনী। শ্রীবিলাস লক্ষ্য করেছে, জীবনপিপাসু দামিনী কি ভয়ঙ্কর অন্তর-পীড়ায় শচীশের প্রতি ভালোবাসা বহন করছে, কিভাবে সে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ শ্রীবিলাস দামিনীর বেদনার প্রতি সমমর্মিতা সূত্রে[৫৯] ক্রমশঃ তাকে ভালোবাসে সংগোপনে।

---

৫৭ জ্যাঠামশায়, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০

৫৮ শচীশ ৪, ঐ, পৃ. ৪৫২

৫৯ "অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টন্ টন্ করিতে থাকিত", শচীশ ৭, ঐ, পৃ. ৪৫৭

গুহা থেকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দামিনী শ্রীবিলাসের ঘনিষ্ঠ হয়। শচীশ জানতো এটা তার ছদ্মআচরণ, শচীশের মনে ঈর্ষা সঞ্চার করার জন্যই সে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার স্বগতঃ উচ্চারণ অনুধাবনীয় :

> দামিনী শচীশকে কেবলই এড়াইয়া চলে, তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উলটা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেই জন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কী দেখিল, কী হইল—সেই-সমস্ত সামান্য কথা সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়।[৬০]

দামিনীর আচরণ ব্যর্থ হলো না, শচীশ তাকে সাধন-সঙ্গিনী হতে আহ্বান জানায়। সে আহ্বান প্রতিরোধ করার শক্তি নেই দামিনীর। তার কাছে শ্রীবিলাস আজ অতিরিক্ত, নিষ্প্রয়োজনীয় :

> ---এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার 'পরে তার সমস্ত ফর্মাশ হঠাৎ একেবারেই বন্ধ। আমার যে-কয়টি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুর-ছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গীহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।[৬১]

নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার প্রতিক্রিয়ায় শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাস লীলানন্দ স্বামীকে ত্যাগ করে এক পোড়ো বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। শচীশ সাধনা শুরু করে আত্মোপলব্ধির নিঃসঙ্গ পথে। দামিনীরও শুরু হয় শচীশমুখী সাধনার আর-এক পর্যায়। শ্রীবিলাসের ভালোবাসা তার গভীরতম চেতনা-স্তর আলোড়িত করে; কখনো তার মনে জন্ম নেয় ঈর্ষানুভূতি, কখনো সে আন্তর অভিজ্ঞতায় হয়ে ওঠে ক্ষুব্ধ।

কিন্তু ব্যর্থ হয় দামিনীর সকল সাধনা। শচীশ তাকে পাঠিয়ে দেয় কলকাতায়; সঙ্গে শ্রীবিলাস। দামিনী তার নব-উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করতে সম্মত হয়। শচীশের স্মৃতিচালিত দামিনীকে সে নির্দ্বিধায় জীবনে গ্রহণ করে, কারণ শ্রীবিলাস দামিনীকে ভালোবাসে, সে পজিটিভিস্ট এবং সে বিশ্বাস করে :

> আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।[৬২]

কিন্তু দুর্ভাগ্য শ্রীবিলাসের; সমুদ্রতীরের শচীশের পদাঘাতে দামিনী দুরারোগ্য বক্ষরোগে আক্রান্ত হয়। শ্রীবিলাসের সমস্ত শুশ্রূষা ও চেষ্টা ব্যর্থ করে দামিনী মারা যায় ফাল্গুনের প্রথমে।

---

৬০ দামিনী ২, 'চতুরঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪

৬১ দামিনী ৫, ঐ, পৃ. ৪৭৪

৬২ শ্রীবিলাস, ঐ, পৃ. ৪৭৯

তবুও 'চতুরঙ্গের' পরিসমাপ্তি দামিনীর মৃত্যুসংবাদে নয়। এ উপন্যাসের সমাপ্তি দামিনীর মৃতদেহ দাহ শেষে ভগ্ন নীলকুঠির প্রাঙ্গণে নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখী স্মৃতিময় শ্রীবিলাসের একাকিত্বের ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনায়। শচীশ তার 'হাঁ' ও 'না' এর সংশ্লেষনীতে স্থিতধী হয়েছে, দামিনীও তার নবোপলব্ধির চরিতার্থতা পেয়েছে, কিন্তু শ্রীবিলাস কি পেল ?

শ্রীবিলাসের অধ্যাত্মলোক নেই, ঈশ্বর নেই ; তার দামিনীও রইল না। এমন সীমাহীন শূন্যতায় বহুস্তরীভূত বেদনায় রবীন্দ্রনাথ তার আর কোন চরিত্রকে নিক্ষেপ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের দ্বিমুখী বঞ্চনার ট্র্যাজেডিকে 'চতুরঙ্গে'ই প্রথম গূঢ়ার্থবাহী করেন। পরিণামে স্মৃতিময় ভগ্ন নীলকুঠি, তার নৈঃসঙ্গ্য এবং জীর্ণসত্তায় শূন্যতা ও স্মৃতিলালনকারী একাকী শ্রীবিলাস—যেন পরস্পর সমার্থক, অন্তঃস্পন্দনে প্রতিসম, প্রতীকী পরমার্থে লোকোত্তর। আধুনিক যে মানুষ অধ্যাত্মবিশ্বাস থেকে উন্মূলিত, অথচ জীবনে পরাভূত, বঞ্চিত—শ্রীবিলাস সে-সব বিপন্ন অস্তিত্ব মানুষের পূর্বপুরুষ। কেবল আঙ্গিক উদ্‌ভাবনার অপূর্বতায় কিংবা মগ্নচৈতন্য প্রবাহের অনুষঙ্গ বয়নে অথবা আশ্চর্য অলঙ্কারযোজনা দক্ষতাতেই নয়, জীবনবীক্ষণের এই বিস্ময়কর অগ্রগামিতায়, 'চতুরঙ্গ' সমুজ্জ্বল।